ছবি

গুরুগম্ভীর আলোচনা ছেড়ে এবারে একটি অণুগল্প। **মৃণাল নন্দী** এই গল্পটি লিখেছিলেন আকাশ পত্রিকায় আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ সংখ্যায়। সেখান থেকে এবার এই ব্লগে পরিমার্জিত রূপে।

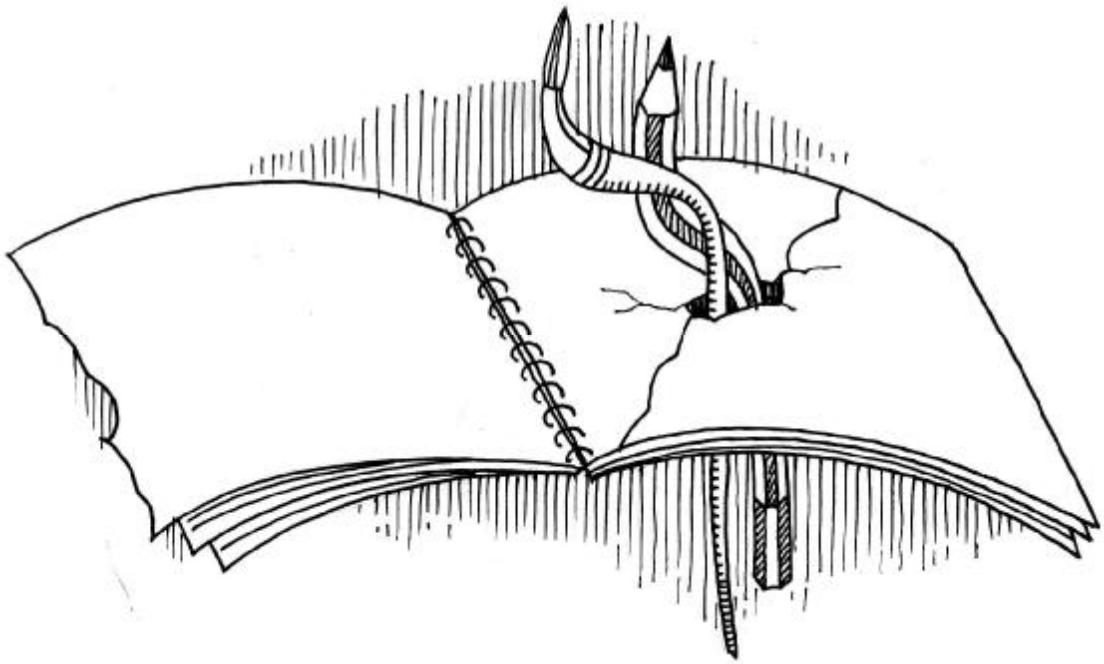

সে আছে একজন। দেখা হলেই হাসে। মাঝে মাঝে হাতছানি দিয়ে ডাকে। যাব কি যাব না ভেবে আমি যখন দ্বন্দ্বে পড়ি তখনও হাসে। সে হাসতে ভালোবাসে।

আমি ষোলো, সে উনিশ। আমি হাফ প্যান্ট, সে ফ্রক। আমি ঘরকুনো, সে পাড়াবেড়ানি।

একদিন সে আমাকে ডাকলো – তোর নাম কি?

– অনীশ।
– আমি মণীষা। আমরা চৌধুরী। তোরা?
– রায়।
– তবে জমবে ভালো। দু'য়ে মিলে রায়চৌধুরী।

সে আমাকে তার ড্রয়িং খাতা দেখালো। ছোটো থেকেই নাকি ছবি আঁকে। চারখানা খাতা ভর্তি তার আঁকা। প্রথমটাতে ফুল-নদী-পাহাড় – সিনারী।

পরদিন গেলাম আবার। এই খাতাটাতে শহরের জঙ্গল, ঘিঞ্জিপাড়া, ল্যাম্পপোষ্টে কাক।

পরের দিনের খাতাটাতে শুধু মানুষের মুখ। কোথাও আনন্দের, কোথাও যন্ত্রণার। কোথাও বানরের মতো কদাকার।

পরদিনও গেলাম। কিন্তু শেষখাতাটা সে আমায় দেখাতে রাজী হলো না। বলল, 'পরে দেখাবো।'

আমার বোকা বোকা মুখ দেখে হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই কথাটা বলল সে। 'তুই হাফ প্যান্ট পরিস কেন রে? এত বড়ো হলি ফুলপ্যান্ট পড়তে পারিস না? আমি লজ্জা পেলাম। সে আবারও হেসে ফেলল।

পরদিন গেলাম ফুলপ্যান্ট পড়ে। দেখে সে হেসে ফেলল। 'আমার কথা শুনে পাল্টে গেলি? আয় আজ তোকে শেষ খাতাটা দেখাবো।'

শেষ খাতাটার প্রথম পাতা। আমার গা-টা শিরশির করে উঠল। ন্যুড স্টাডি। শুধু ছেলেদের। বন্ধ করে দিলাম।

– তুমি এসব ছবি আঁকো?
– কেন, কি হয়েছে?
– তোমার লজ্জা করে না বাজে ছবি আঁকতে? আমার প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলল সে।

একমাস পর

– ওভাবে নয়, ঠিক করে দাঁড়া। ঘুরে দাঁড়ালাম।
– থুতনিটা নিচের দিকে কর।

করলাম। সে ছবি আঁকছে আমার। তার চার নম্বর খাতাতে। এখনও সাত পাতা বাকী আছে ঐ খাতার। তার মানে এখনও আরো সাতদিন এই নরকযন্ত্রণা।

হঠাৎ আমার ভিতরের মনটা কথা বলে উঠল। আমি সোজা দাঁড়ালাম। পোষাক ঠিক করলাম। তার কপালে ভাঁজ। বোধহয় বিরক্তির। হাসি উধাও। এবার আমি হাসলাম। তার দিকে এগিয়ে গেলাম। খাতার দিকে তাকালাম। ছবিটার অর্ধেক হয়েছে। তার হাত থেকে পেনসিলটা নিয়ে ভেঙে দু'টুকরো করলাম। খাতাটাও কেড়ে নিলাম।

এবার মন দিয়ে খাতাটা ছিঁড়তে হবে। তারপর নতুন খাতা আর নতুন পেনসিল। নতুন ছবি আঁকা হবে সেখানে।

- *অলঙ্করণ : কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত*